০৩-১০-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - খুব বড় বিচিত্র ওস্তাদ পেয়েছো তোমরা। একমাত্র ওঁনার শ্রীমত অনুসারেই যদি চলতে থাকো তোমরা, তবে ডবল মুকুটধারী দেবতা হতে পারবে"

প্রশ্ন :- এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে যেন কখনোই ক্লান্তি না আসে - তার জন্য কি এমন সহজ পুরুষার্থ আছে?

উত্তর :- এই পঠন-পাঠনের মধ্যে কখনও যদি নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান-এর বিষয় আসে, তাতেও কিন্তু একই স্থিতিতে থাকবে। তা একপ্রকারের খেলা ভাবলে তবে কখনোই এই পাঠে ক্লান্তি আসবে না। সবচেয়ে বেশী নিন্দা হয় তো কৃষ্ণের। লোকেরা কতই না কলঙ্ক লাগায় তার নামে, তারাই আবার তাকে পূজা করে। অতএব এই গালি-গালাজ কোনও নতুন ঘটনা নয়, এর জন্য যেন এই জ্ঞানের পাঠে অনাগ্রহ বা ক্লান্তি না আসে। বাবা যতক্ষণ পর্যন্ত পড়াবেন, ততক্ষণ পড়তে থাকো।

(বনবারী= বনমালী/ শ্রীকৃষ্ণ)
গীত :- বনবারী রে, জীনে কা সাহারা তেরা নাম রে, মুঝে দুনিয়াবালো সে ক্যা কাম রে

ওঁম্ শান্তি! কে গাইছে এই গীত? কে কাকে উদ্দেশ্য করে বলছে একথা? তা কেবল তোমরা বি.কে.-রাই জানো। যাদের গোপ-গোপী বলা হয়, তারাই জানে। বাচ্চারা তাদের আপন বাবা গোপীবল্লভকে স্মরণ করছে। এমন বাবা আর যে কেউ হতেই পারে না, একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া। পূর্বে কখনও নিশ্চয় উনি এখানে এসে থাকবেন, তাই তো এভাবে আকুল হয়ে স্মরণ করে ওনাকে। প্রশস্তি তো পরবর্তী কালেই করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ - যীশুখৃষ্ট এসে খ্রিস্টান ধর্মের স্থাপনা করে। কিন্তু সে যদি অন্য কোথাও না যায়, তখন তো তার পালনা অবশ্যই করতে হয়, তখন ওনাকে অবশ্যই পুনঃ জন্মেই আসতে হয়। কিন্তু যিনি ধর্ম স্থাপনা করে গেলেন, তাই প্রতি বছরই তার জন্মদিন পালন করা হয়। অবশ্য যারা ভক্তি-মার্গের কেবল তারাই তাকে স্মরণ করবে। ঠিক তেমন ভাবেই আজকাল দশহরা বা দূর্গোৎসব পালন করা হয়, নিশ্চয় তা শুভ বলেই। কেউ তেমন ভাল কিছু করলে তবেই তো তার উৎসব করা হয়। এমনই দীপমালা বা দীপাবলী উৎসবও, যা আমরা পালন করি। কৃষ্ণ-জয়ন্তীও এমন কারণেই পালন করি। কিছু শুভ হবার কারণেই, সেই স্মৃতিতে উৎসবগুলি পালন করা হয়। বর্তমানের ভারত-বাসীদের তো এটাই জানা নেই যে রাখী ইত্যাদি উৎসবগুলি কেন পালন করা হয়, বা কি ঘটেছিলো তখন? যদিও তারা জানে যীশুখ্রীষ্ট-গৌতম বুদ্ধ এনারা এসেছিলেন ধর্মের স্থাপনা করতে। বর্তমান সময়কালটা আসুরী সম্প্রদায়ের, কেবলমাত্র তোমরা বি.কে-রাই ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের। বাবা অর্থাৎ 'রাম' এসে তোমাদের শ্রেষ্ঠাচারী বানাচ্ছেন অথবা এভাবেও বলতে পারো পরমপিতা স্বয়ং এসে স্বর্গ-রাজ্যের উদ্ঘাটন করাচ্ছেন অর্থাৎ ভিত স্থাপন করছেন। যাকে তোমরা ওপেনিং সেরিমনি-ও বলতে পারো। এই ভারত থেকেই শ্রেষ্ঠাচারী মহারাজা-মহারাণীর নির্মাণ হয়। পূর্বে সত্যযুগী দেবী-দেবতারাই ডবল মুকুটধারী ছিলেন। তাদের যেমন ছিল পবিত্রতার মুকুট, তেমনি ছিল হীরে জহরত, মণি-মুক্তোর মুকুট। আর বিকারী রাজাদের ছিল কেবল রত্ন-জড়ির মুকুট। এই এক মুকুটধারীরাই দ্বি-মুকুটধারীদের পূজো করতো। কিন্তু কখন তা ঘটেছিল, কিভাবেই বা তারা সেই রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার পেয়েছিল - এসব লোকেদের জানা নেই। লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বি-মুকুটধারী দেবী-দেবতা ছিলেন। কিন্তু তাদের এমন শ্রেষ্ঠ বানিয়েছিলেন কে? এই

বাবা-ই বসে বসে তাদের সেসব কিছু বুঝিয়েছিলেন। এই যে দশহরা উৎসব, নিশ্চয় কোনও না কোনও ঘটনার স্মৃতিতেই তা পালন করে, উৎসবের প্রতীক হিসাবে রাবণকেও জ্বালানো হয়। কিন্তু রাবণ কি কোনও জ্বালানোর বস্তু? তার রাজত্ব তো এখন শেষ হতে চলছে। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত শ্রেষ্ঠাচারী রাম-রাজ্যের স্থাপনা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভ্রষ্টাচারী রাবণ-রাজ্য চলতে থাকে। রাবণ-রাজ্যের বিনাশ আর রাম-রাজ্যের স্থাপনাতে সেই সেরিমনি (পর্বাদি) পালন করা হয়। রাবণকে জ্বালানোর প্রতীক হলো ভ্রষ্টাচারী আসুরী রাজত্বের অবসান। ভ্রষ্টাচারেরও আবার শ্রেণী-বিন্যাস আছে। যা চলে আসছে দ্বাপরের শুরু থেকেই। শুরুতে ভ্রষ্টাচার থাকে ২-কলা, তারপর ৪-কলা, ৮-কলা, ১০-কলা .... এইভাবে বাড়তে বাড়তে সম্পূর্ণ ১৬-কলাই ভ্রষ্টাচার হয়ে যায়। এই ১৬-কলা ভ্রষ্টাচারকে ১৬-কলা শ্রেষ্ঠাচারী বানানো, তা একমাত্র এই বাবার দ্বারাই সম্ভব।

বাবা বোঝাচ্ছেন, যেহেতু এখন রাবণ-রাজ্য, সবাই ভ্রষ্ট হয়েই আছে। কিন্তু রামরাজ্য ছিল শ্রেষ্ঠাচারী, যখন ভারতকে স্বর্গ-রাজ্য বলা হতো, যা আজ এমন ভ্রষ্ঠাচারীতে পরিণত। তাই বাবা জানাচ্ছেন-উনি এসেছেন ভ্রষ্টাচারী রাজ্যকে শ্রেষ্ঠাচারী করে গড়ে তুলতে। এখানে যেমন যাদব-কুল আছে, তেমনি আছে কৌরব-কুলও। যাদব-কুলে আবার অনেক প্রকার ধর্মের সমাগম। যারা একদা শ্রেষ্ঠাচারী দৈবী-ধর্মের ছিলো তারাই আজ ধর্ম-ভ্রষ্ট, কর্ম-ভ্রষ্ট। বাবা আবারও তাদেরকে শ্রেষ্ঠ-কর্ম করতে শেখান। ভক্তি-মার্গে তারই উৎসব পালন করা হয়। আর এই কর্ম-কর্তব্যের নিমিত্তে পূর্বেও অবশ্যই বাবা এসেছিলেন-যা আজ থেকে ৫-হাজার বছর পূর্বেকার কথা। উনি এসেই ভ্রষ্টাচারীদের শ্রেষ্ঠাচারী করে গড়ে তুলেছিলেন। সমগ্র দুনিয়াকেই শ্রেষ্ঠাচারীতে রূপান্তর করা একমাত্র এই বাবা-রই কাজ তা। তারপর আবার এখানে পাঠিয়ে দেন, তোমরা যে দৈবী-ধর্মের স্থাপনা করো, তার পালনার জন্য। একথা বলার অপেক্ষা থাকে না, ড্রামার চিত্রপট অনুসারে অটোমেটিকেলী তা হতে থাকে। তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী হবার সাথে সাথে সৃষ্টি-জগৎ-ও সতোপ্রধান ও শ্রেষ্ঠাচারী হতে থাকে। বর্তমানে তো ৫-তত্ত্বই তমোপ্রধান অবস্থায়। তাই তো এত উথাল-পাতাল অবস্থা। মনুষ্যরাও আজ কত দুঃখী। কত কোটি-কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে চারিদিকে। সত্যযুগে এমন কোনও উপদ্রব হয় না, যা হয় কেবল এই নরক-রাজ্যেই। এই উপদ্রবের মাত্রাও প্রথমে ২-কলা থাকে, যা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে এখন ১৬-কলা সম্পূর্ণ। এসব আরও বিস্তারে বোঝানে উচিত। যদিও তা সহজবোধ্য, তবুও না তো লোকেরা বুঝতে পারে, আর না তোমরা সেভাবে বোঝাতে পারো। রাবণকে জ্বালানো শুরু হয় দ্বাপর থেকে। তা কিন্তু ৫-হাজার বর্ষ পূর্ব থেকে নয়। ভক্তি-মার্গ শুরু হলে তবেই তো উপদ্রব শুরু হয়। এরপর কিভাবে রাবণ-রাজ্যের বিনাশ হয়ে রাম-রাজ্যের স্থাপনা হয় - তা তো তোমাদের জানা। লোকেরা তো এটাই জানে না -রাবণ কি? বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন, লঙ্কা নামে সত্যযুগে কোনও কিছুই ছিল না। তখন তো জনসংখ্যাও ছিল খুব কম। যা জনবসতি ছিল তা কেবল যমুনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল-গুলোতে। আজমেরের স্বর্ণ-মন্দিরে বৈকুন্ঠের একটা মডেল আছে, তবুও লোকেরা তা বোঝে না। স্বর্গ-রাজ্যে সোনার মহল বানাতে বিশেষ সময়ও লাগে না। উন্নত মেশিনারীতে মুহূর্তেই সোনা গলিয়ে টালি ইত্যাদি বানানো যায়।

বাচ্চারা, এই বিজ্ঞান-ই বিনাশ ঘটাবে। সেই বিজ্ঞান-ই আবার আবার সেখানে তোমাদের কাজে আসবে। এই যে এরোপ্লেন ইত্যাদি যা খুশীর জন্য বানানো হচ্ছে, এগুলির দ্বারাই বিনাশ ঘটবে। যা সুখের জন্য তা আবার দুঃখেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুখ তো অল্পকালের জন্য। গত ১০০-বছরের মধ্যেই এসবের আবিষ্কার হয়েছে। এবার নিজেরাই ভেবে দেখ, বিনাশের পর কত অল্প সময়ের মধ্যেই

নতুন সেই দুনিয়ায় সবকিছুই তৈরী হয়ে যাবে। মুহূর্তেই সোনার মহল তৈরী হয়ে যাবে। এই ভারতেই এমন সব সোনা-রুপার মহল তৈরী হবে, যাতে লাগানো থাকবে হীরে-জহরত, মণি-মুক্তো। বিশাল আকারের হবে রাজ-দরবার। রাজ-রাজারা নিজেরা সবাই একত্রিত হবে সেখানে। তাকে পাণ্ডব-সভা বলা হয় না কিন্তু, বলা হয় লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানীর সভা। রাজকুমারেরা-রাজকুমারীরা সবাই এসে বসবে সেখানে। যেমন, যখন ব্রিটিশ সরকার ছিল, তখন রাজকুমার-রাজকুমারী ও রাজা-মহারাজাদের বিশাল সভা বসতো। সবাই যে যার নিজের মুকুট পরিধান করতো। নেপালে ব্রহ্মাবাবা যখন যেতেন, তখন সেখানেও রাজ পরিবারের সভা বসতো। বড় মুকুটধারী রাজাও সেখানেই বসতেন। যারা মহারাজা-মহারাণী। তাদের মধ্যেও ক্রমিক অনুসার ছিল। অন্য রাণীরা পর্দার আড়ালেই থাকতো। মহা সমারোহে জাঁকজমক সহকারে বসতো তারা। উনি (ব্রহ্মা) বলতেন, এ যেন সেই পাণ্ডব রাজ্যের সভা। তারা নিজেদেরকে সূর্য-বংশী বলে পরিচয় দিত। যদিও এখন তারা এক-মুকুটধারী, পূর্বে দ্বিমুকুটধারী-ই ছিল। তারা কৃষ্ণের বিষয়েও অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করেছে - একে নিয়ে পালিয়েছে, এইসব করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও বাস্তব কিন্তু তা নয়।

কোনও ঘটনা ঘটার পর, তা অতীত হয়ে গেলে তাকেই উৎসব হিসাবে পালন করে লোকেরা। তেমনি রাবণ-রাজ্যের অবসান হয়ে রাম-রাজ্য স্থাপনার সময়টিকে প্রতি বছরই পালন করা হয়। এতেই তো প্রমাণিত, আসুরী রাবণ-রাজ্য আজ থেকে ৫-হাজার বর্ষ পূর্বেই ছিল। তখনও বাবা এসেছিলেন, এসে রাবণ রাজ্যের বিনাশও ঘটিয়েছিলেন। সেই মহাভারতের মহা-লড়াই আবার তোমাদের সামনে উপস্থিত। রাবণ কোনও ব্যক্তি বা বস্তু নয়। কিন্তু রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর কথাও যে উল্লেখ আছে। যদিও রাবণ এর মতন মন্দোদরীকে দশ-মাথার দেখানো হয় না। যেমন বিষ্ণুর চার-হাত দেখানো হয়। তা আসলে দুই-হাত লক্ষ্মীর আর দুই-হাত নারায়ণের। যেমন রাবণের দশ-মাথা দেখানো হয়, তা হলো ৫-বিকার রাবণের আর ৫-বিকার মন্দোদরীর। বিষ্ণুর চর্তুভূজের অর্থও তেমনই। পূজা কিন্তু করা হয় চার-হতের মহালক্ষ্মীকেই। যাকে দীপমালা উৎসবে আহ্বান করা হয়। কিন্তু তা হলে নারায়ণ-ই বা কি দোষ করলো? লক্ষ্মীকে ধন-সম্পদ দেবে তো নারায়ণ। আসলে উভয়েই তো সমান ভাগীদার। বাস্তবে লক্ষ্মীর কাছে তো ধন-সম্পদ থাকেই না। ধন-সম্পদ-দাত্রী তো জগদম্বা। তোমরা বি.কে.-রা তা জানো! যিনি এখন জগদম্বা আগামীতে তিনিই আবার লক্ষ্মী। কিন্তু লোকেরা তা পৃথক পৃথক করে দেখায়। এই জগদম্বার কাছেই সবকিছুর প্রার্থনা করা হয়। কোনও প্রকারের দুঃখ-কষ্ট হলে, কারও বাচ্চা মারা গেলে, তখন জগৎ অম্বাকে বলে- "আমাদের রক্ষা করো, আমাকে বাচ্চা দাও, আমার রোগ-ভোগ সারিয়ে দাও"- এরকম অনেক ধরণের কামনা করতে থাকে। কিন্তু, লক্ষ্মীর কাছে তো কেবল ধন-দৌলতের কামনা, বাস্ এইটুকুই। আর জগত অম্বা তো সব কামনাই পুরো করেন। লোককে ধনবান তো ইনিই বানান। তাই তো তোমাদের যাবতীয় চাহিদা পূরণ হয় এনার ইচ্ছাতেই। এই ধন-সম্পদ কোনও জাগতিক ধন-সম্পদ নয় - এ হলো জ্ঞানের সম্পদ, যার পাঠ পড়িয়ে থাকেন উনি- ফলে তোমরাও কত নিম্ন-স্তর থেকে উন্নীত হয়ে কত উচ্চ-স্তরে পৌঁছে যাও। তারপর তোমরা নিজেরাই যখন লক্ষ্মীর মতন হও, তখন তো খুবই ধনবান হয়ে যাও। এই সময়ে গুণ ও শক্তির সাহায্যে তোমরা নিজেরাই নিজেদের সর্ব-প্রকার কামনাগুলি পুরো করতে পারো। যেহেতু তা জগদম্বার দান। লক্ষ্মী-দেবী এসবের দান দিতে পারেন না। উনি যদি দান দিতে পারতেন, তবে জগতে না তো কেউ ক্ষুধায় মরতো, আর না কেউ কাঙ্গাল হতো। সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে রাবণের কোনও অস্তিত্বই থাকে না। রাবণকে জ্বালানো হয় এই কলিযুগে। দশহরার পর রাবণকে জ্বালিয়ে দীপাবলীর উৎসব পালন করা হয়। লোকেরা এই ভাবধারায় খুশী হয় যে রাবণ-

রাজ্যের বিনাশ হলেই রাম-রাজ্যের স্থাপনা হবে। প্রতি ঘরে যে আলোয় আলোকিত করা হয়, যাতে তোমাদের আত্মাও আলোকিত হয় তাতে। সঙ্গম-যুগের এইসব ঘটনাক্রম সত্যযুগে ঘটে না।

বাচ্চারা, তোমরা বি.কে.-রা ত্রিকালদর্শী। তোমরা তোমাদের প্রলব্ধ ভোগ করো স্বর্গ-রাজ্যে গিয়ে। এইসব জ্ঞান তখন ভুলেই যাও। সঙ্গমযুগ হলো স্থাপনা আর বিনাশ এর জন্য। স্থাপনা হয়ে গেলেই সঙ্গমের সমাপ্তি। এইসব উৎসব ইত্যাদির প্রকৃত কারণগুলির জ্ঞান কেবল বি.কে.-রাই জানে ও বোঝে। জগতের অজ্ঞানী লোকেরা এসবের কিছুই বোঝে না। তারা উল্টো-পাল্টা অনেক কিছুই বানিয়ে বলে, যা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য প্রকৃত তথ্য নয়। এখন বাস্তবে তোমরা যা দেখছো, সত্যযুগে এসব কিছুই ঘটবে না। শাস্ত্রগুলিতে আবার নারদের বিষয়েও নানান কথাও তো আছে। তোমাদের কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, তখন তোমরাও (নারদের মতন) জানাবে- বাবা, আমি লক্ষ্মীকেই বা নারায়ণকে বিয়ে করবো। তা শুনে বাবা বলেন - আগে (মন আয়নায়) নিজেকে বিচার করে দেখো, নিজেদের মধ্যে কোনও প্রকার বিকার নেই তো! ক্রোধ বা অন্য কোনও বিকার থাকলে তবে তা হতে পারবে কি প্রকারে? এখনও পর্যন্ত তো কেউ-ই সম্পূর্ণ হতে পারোনি। কিন্তু হতে যে হবেই তোমাদের। এইসব বিকারী ভুতগুলিকেও তাড়াতে হবে, তবেই তো এত উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে। চমৎকার পারদর্শী ওস্তাদকে পেয়েছো যে তোমরা। উনি এমনই বাবা, যিনি সর্বগুণ সম্পন্ন, জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, যিনি তার বাচ্চাদেরও সর্বগুণ সম্পন্ন দ্বি-মুকুটধারী দেবতা গড়ে তোলেন-প্রতি কল্পে তোমরা বি.কে.-রাই এই বাবার আপন বাচ্চা হও। একমাত্র দেবতারাই দ্বি-মুকুটধারী হন। তোমরা এসেছো বাবার থেকে সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা নিতে। এখানে যেমন আশীর্বাদ পাওয়া যায়, তেমনি পড়াশুনাও করতে হয়। পয়েন্টগুলিকে ধারণ করতে হয়। তোমরা নিজেরাই যদি তেমন পড়াশোনা না করো তবে অন্যদের তা বোঝাবে কিভাবে? এই অবিনাশী ড্রামা হুবহু পুনরাবৃত্তি হয়। এখন যেসব জ্ঞান ধারণ করছো, আগামীতে তা লুপ্ত হয়ে যাবে। এই লঙ্কা (শ্রীলঙ্কা) ইত্যাদি যা কিছু আছে, তারও কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। আচ্ছা, রাবণের জন্ম কখন হয়েছিলো? শাস্ত্রে যা লেখা আছে, দ্বাপর থেকে দেবতারা বাম-মার্গে চলে যায়, আর তখন থেকেই লোকেরা বিকারী হতে শুরু করে। ভক্তি-মার্গ শুরুতে অব্যভিচারী থাকে পরে তা ব্যভিচারী হয়ে যায়। আজকাল তো মানুষেরা তাদের নিজেদেরকেও পূজা করায়। বাবা জানাচ্ছেন - উনি আসেন ভ্রষ্টাচারী দুনিয়ার বিনাশ ঘটিয়ে শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া স্থাপন করতে। তা করতে হলে প্রথমে শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়ার স্থাপনা করে তারপর ভ্রষ্টাচারী দুনিয়ার বিনাশ করতে হয়। কল্প-কল্প ধরে এই কর্ম-কর্তব্যই ওনার! ভ্রষ্ঠাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে সময়ও লাগে অনেক। যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা স্বয়ং বসে পড়াতে থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই পাঠ পড়তেই হয়। কল্প পূর্বে যে যতটা পড়াশুনা করেছিল, এখনও সে ততটাই করবে। অনেক বি.কে. এই জ্ঞানের পথে চলতে চলতে বলে বসে - ব্যস্ আমি আর জ্ঞানে চলতে পারবো না। -- আরে, নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান এসব তো থাকবেই। কিন্তু তা বলে তুমি তোমার পড়াশোনা কেন ছাড়বে? সবচেয়ে বেশী নিন্দা তো কৃষ্ণের প্রতি করা হয়। লোকেরা কত ধরণের কলঙ্ক লাগায় তার চরিত্রের নামে। তারপরেও কেন আবার তার পূজা-অর্চনাও করে? বাস্তবে - বর্তমান সময়ে সেই গালি এই ব্রহ্মাবাবাকেই তো দেওয়া হয়। পুরো সিন্ধ-প্রদেশেই তার কত নিন্দা ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু কেউ তাকে কিছু করে উঠতে পারেনি। এসবই যে ড্রামার খেলা। এ নতুন কিছু নয়। কল্প পূর্বেও এমনই গালাগালি করা হয়েছিল তার প্রতি। তাই তিনি নদীর এপাড়ে চলে আসেন। তোমরা বি.কে.-রাও তেমনই সিন্ধু পার করে সেই একই পারেই আছো এখন। সেখানে কিন্তু কোনও কৃষ্ণ ছিল না, এই ব্রহ্মাবাবা অর্থাৎ দাদা-রই আসা-যাওয়া ছিল। তোমরা এও জানো

যে, তোমরা বি.কে -রা এখন যে রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার পাও, পরবর্তীতে তা আবার খুইয়েও ফেলো। এমনই আজব খেলার নাটক এটা। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের প্রতি।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সবার মনোকামনা পূরণকারী কামধেনু (জগদম্বা)-র মতন হতে হবে। জ্ঞানের দান করেই যেতে হবে।

২) স্তুতি বা নিন্দা উভয় কারণেই একই সমান স্থিতিতে থাকতে হবে। কোনও কারণেই এই পাঠ পড়া ছাড়বে না যেন। সেগুলিকে খেলার অঙ্গ ভেবে তাকে অতিক্রম করে যেতে হবে।

বরদান :- শুদ্ধ মন আর দিব্য বুদ্ধির বিমান দ্বারা সেকেণ্ডেই 'সুইট-হোম'-এর যাত্রা করতে পারা মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

বিস্তার:- বিজ্ঞানীরা অতি দ্রুত গতি যন্ত্রের আবিষ্কারে ব্যস্ত, যার জন্য অনেক খরচও করে চলেছে, কত শক্তি আর কত সময় ব্যয় করে চলেছে। কিন্তু তোমাদের কাছে এমন তীব্র গতির যন্ত্র আছে, যা বিনা খরচেই ভাবনার সাথে সাথেই গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারো। শুভ সংকল্প ও দিব্য বুদ্ধির দ্বারা যা তোমরা পেয়ে থাকো। এই শুদ্ধ সংকল্প ও দিব্য বুদ্ধির বিমানের দ্বারা যখন ইচ্ছা তখনই পৌঁছে যেতে পারো আবার যখন চাও তখনই ফিরতে পারো। এমন মাস্টার সর্ব-শক্তিমানদের কেউ থামাতেই পারে না।

স্লোগান :- দিল (হৃদয়) সদা স্বচ্ছ থাকলে 'দিলারাম' বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা বর্ষিত হতেই থাকে।